একক 1 □ ভূকম্প ও ভূগোলকের আভ্যন্তরীণ গঠন

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.2 ভূকম্পের ফলাফল

1.3 ভূকম্প তরঙ্গের বিস্তারণ প্রক্রিয়া

1.4 ভূকম্পের উৎপত্তির কারণ

1.5 ভূকম্পের শ্রেণীবিভাগ

1.6 প্রধান প্রধান ভারতীয় ভূকম্প

1.7 ভূগোলকের অভ্যন্তরীণ গঠন

1.7.1 ভূত্বক

1.7.2 পৃথিবীর ম্যান্টেল

1.7.3 ভূগোলকের অস্থি

1.8 সারাংশ

1.9 নির্বাচিত উল্লেখ্য গ্রন্থ

1.10 প্রশ্নাবলী

1.11 উত্তর সংকেত

1.1 প্রস্তাবনা

সব ধরনের অন্দরের ভূতাত্ত্বিক শক্তির মধ্যে সম্ভবত ভূকম্পন আমাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত। ভূকম্প ঘটার কালে ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হয় এবং কখনো কখনো ফেটে যায়, দিঘি এবং পুকুরের জল ফুলে ওঠে আর নদী ও সাগরের জল সুবিশাল তরঙ্গে ভূভাগকে প্লাবিত করে। সুতরাং, দীর্ঘকাল ধরে মানুষ ভূকম্পের কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছে, যাতে প্রাকৃতিক শক্তির এই ভয়াবহ তাণ্ডব থেকে তাদের বসতি এবং সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হয়। শান্ত জলে যেমন একটা ঢিল পড়লে ঢিলের আঘাতে জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি যে উচ্চমাত্রার ভূকম্পে ঘটে থাকে তা দেখা গিয়েছিল 1897 খ্রীষ্টাব্দে আসামের ভূকম্পে।

যখন কোন ভারি গাড়ি অথবা দ্রুতগামী ট্রেন চলে যায় কিম্বা কোথাও কোনরকম বিস্ফোরণ ঘটে, তখন চারপাশের ভূমি কেঁপে ওঠে। অবশ্য এধরনের কম্পনে কদাচিৎ আমাদের জীবন বা সম্পত্তির কোনো ক্ষতি ঘটে থাকে। ভয়াবহ ভূকম্পনগুলি অবশ্য এরকম কোনো অভিঘাতে ঘটেনা, সেগুলির উৎপত্তি কঠিন ভূ-দেহে বিচিত্র এবং জটিল বিন্যাস ঘটার সময়ে। এধরনের ভূকম্পে ভূগোলকের দেহে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে থাকে। স্থাপত্যের গ্রিক দেবতা টেক্টন (Tekton)-এর নামে এধরনের ভূকম্পের নাম দেওয়া হয়েছে টেক্টনিক ভূকম্প। বোমার বিস্ফোরণ বা ভারি যানবাহনের চলাচলে উদ্ভূত ভূকম্পের নাম স্থানীয় ভূকম্প।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- ভূকম্পের মুখ্য ও গৌণ ফলাফল বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- ভূকম্প তরঙ্গের বিস্তারণ প্রক্রিয়া ও মাত্রাসাপেক্ষ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভূকম্পতরঙ্গের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন এবং এদের প্রকারভেদ করতে সক্ষম হবেন।
- ভূকম্পের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করতে পারবেন এবং ভূকম্পের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- কিভাবে ভূকম্পতরঙ্গলব্ধ তথ্যের সাহায্যে ভূগোলকের অভ্যন্তরীণ গঠন—ভূত্বক, ম্যান্টেল এবং অষ্ঠি (core)—সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

1.2 ভূকম্পের ফলাফল

ভূকম্পের ফলাফল দু'ধরনের : (a) মুখ্য এবং (b) গৌণ।

সভ্যতার ইতিহাসে টেক্‌টনিক ভূকম্পের ফলে স্থায়ী ভূ-সংস্থানিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। 1762 সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের উত্তরে এরকম একটি ভূকম্পে শালগাছের জঙ্গাল মধুপুর ব্যুত্থিত (uplifted) হয়। ঢাকা মহানগরীর 100 কিমি উত্তরে বড় ধরনের বিন্যাসের ফলে সে অঞ্চলের পরিবাহ চিত্র বা জলনির্গম প্রণালীর (drainage pattern) পরিবর্তন ঘটে (Fergusson, 1912)।

বিস্তৃত অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত বা সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর ভূকম্পের ফলে ব্যুত্থিত হতে পারে। যেমন 1819 খ্রীষ্টাব্দের 16 জুন কচ্ছের ভূকম্পে কচ্ছের রানের প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চল জোয়ারের জলের সর্বোচ্চ রেখার পাঁচমিটার নিচে নিমজ্জিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন অঞ্চল ব্যুত্থিত হয় (Krishnan, 1968)। এছাড়াও ভূপৃষ্ঠে সুগভীর ফাটল এবং শিলাদেহের বিচূর্ণন ঘটতে পারে।

যদিও গৌণ ফলগুলি টেক্‌টনিক ব্যুত্থান বা নিমজ্জনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, তবু মুখ্য ফলের পরিণতি সেগুলির উৎপত্তিতে। এই গৌণ ফলেই জীবন এবং সম্পত্তির প্রভূত হানি ঘটে। ভূকম্পের প্রধান ধাক্কার অনুগামী রূপে সাধারণত পৌনঃপুনিক কম্পন ঘটে। এগুলির প্রভাবে পাহাড়ে ধস নামে। ধস এবং জমিতে ফাটল পথঘাটের প্রভূত ক্ষতি করে। ভূমির তরঙ্গিত কম্পনে রেলপথ দুমড়ে মুচড়ে যায়, রেলওয়ে সেতু তার নিচের স্তম্ভগুলি থেকে বিচ্যুত হয়, ভূগর্ভের জলের পাইপ এবং বৈদ্যুতিক ও টেলিগ্রাফের কেব্‌ল্‌ ছিঁড়ে যায়। এর ফলে অনেক সময় বর্ত্মক্ষেপ (short circuit) ঘটে আগুন ধরে যায়। টোকিওর ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের আকিৎসুনে ইমামুরা (Akitsune Imamura) বড় মাপের ভূকম্পের কালে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে গেছেন 1923 খ্রীষ্টাব্দের 1 সেপ্টেম্বর সংঘটিত ভূকম্পের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

ভূ-জলে যদি আর্তেজীয় অবস্থা থাকে, তবে ভূকম্পে জমি ফেটে গিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্লাবন ঘটে। 1934 সালের 15 জানুয়ারি বিহার ভূমিকম্পে গঙ্গার দুই পাড় এভাবে প্লাবিত হয়েছিল।

ভূভাগে অথবা সাগরগর্ভে **ভূকম্পের** উৎপত্তি ঘটতে পারে। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ভূকম্পের শক্তি বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়ে অপচিত (dissipated) হয়। যেসব জায়গায় মাটির সুগভীর আবরণ আছে, সেসব অঞ্চলে ভূকম্পের শক্তি ভূকম্পনের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত আন্তর্কণা বিচলনে (intergranular movement) ব্যয়িত হয়ে যায়। 1934 সালের বিহার ভূকম্পে দক্ষিণ বিহার, দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভীষণভাবে প্রভাবিত হলেও গাঙ্গেয় বদ্বীপে তার কোনো প্রভাবই প্রায় পড়েনি। সাগরগর্ভে ভূকম্পের উৎপত্তি ঘটলে যদিও অনুরূপ আন্তর্কণা বিচলনে ভূকম্পের শক্তি ব্যয়িত হয়, তবু সাগরপৃষ্ঠে বিশালাকৃতি তরঙ্গের উদ্ভব ঘটে। উৎসের ঠিক উপরের বিন্দু থেকে এই তরঙ্গ সাগরপৃষ্ঠ ধরে বৃত্তাকারে চতুর্দিকে সঞ্চারিত হয়। যখন এই উঁচু তরঙ্গগুলি সমুদ্রসৈকতে এসে নদী বা খাঁড়িতে ঢোকে, তখন বিধ্বংসী বন্যা ঘটে এইসব নদী এবং খাঁড়ির দুই কূল প্লাবিত হয়। এজাতীয় তরঙ্গের জাপানী নাম ***ৎসুনামি*** (tsunami)। বোধহয় সভ্যতার ইতিহাসে ৎসুনামি সংঘটিত সর্ববৃহৎ প্লাবন ঘটে 1755 সালের লিস্‌বন ভূকম্পে। অনুমান করা হয় এটিই ইতিহাসের সর্বোচ্চ মাত্রার ভূকম্প। জন মিশেল (John Mitchell 1724-1793) ৎসুনামি প্রভাবিত অঞ্চলের বিস্তার দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। 30 মিটার উঁচু সাগরতরঙ্গ বেরিয়ে ইউরোপের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সাময়িকভাবে ডুবিয়ে দেয় এবং পঞ্চাশ হাজার থেকে আশি হাজার মানুষের প্রাণনাশ ঘটায়। লিস্‌বন ভূকম্পের ভূভাগীয় প্রভাব বর্ণিত হয়েছে একটি সরকারী রিপোর্টে। মরক্কো শহরে জমি ফেটে গিয়ে হাজার হাজার লোকের জীবন্ত সমাধি ঘটে। এই ভূকম্পের উপকেন্দ্র ছিল লিস্‌বন শহরের 100 কিমি পশ্চিমে। 1883 সালের 27 আগস্ট যে অগ্ন্যুচ্ছ্বাস ঘটে ক্র্যাকাটাও (Krakatao) দ্বীপটি সম্পূর্ণ উড়ে গিয়েছিল, তার প্রভাবে উৎপন্ন ৎসুনামির উচ্চতা ছিল 15 মিটার। লিসিট জিন (Lisit Zin, 1974) ৎসুনামির নৈসর্গিক প্রভাবের ভিত্তিতে তার যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা সারণি-1-এ দেওয়া হল।

সারণি-1 : ৎসুনামির মাত্রা এবং প্রভাব

মাত্রা	তরঙ্গের উচ্চতা	ক্ষতির পরিমাণ
-1	50-70 সেমি	শূন্য।
0	1-1.5 মি	সামান্য।
1	2-3 মি	ক্ষয়ক্ষতি শুধু সাগরসৈকতে সীমাবদ্ধ।
3	8-12 মি	সাগরপ্রান্ত থেকে ভূভাগের ভিতরে 40 মি দূরত্ব পর্যন্ত ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি।
4	16-24 মি	সাগরপ্রান্ত থেকে 500 কিমি পর্যন্ত ভূভাগের অভ্যন্তরে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি।

টেক্‌টনিক্ ভূকম্পের উৎপত্তি আলোচনার আগে দেখে নেওয়া যাক ভূকম্প তরঙ্গের প্রকৃতি এবং তার বিস্তারণ প্রক্রিয়া।

1.3 ভূকম্প তরঙ্গের বিস্তারণ প্রক্রিয়া

ভূকম্পের উৎস ভূগর্ভে, ক্ষেত্রবিশেষে অতি গভীরে। ফলে, উৎসবিন্দুটি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আওতার বাইরে। কিন্তু, উৎসবিন্দুর ঠিক উপরে ভূপৃষ্ঠে যে বিন্দুটি, সেখানে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। *উৎসবিন্দুর* (focus) উপরের অঞ্চলটিকে বলে *উপকেন্দ্র* (epicentre)। উৎসবিন্দুটিকে আলোকবিদ্যার উৎসবিন্দুর সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় যে, এই বিন্দু থেকে একটি ভূকম্প তরঙ্গ-শ্রেণী (system of seismic waves) উৎপন্ন হয়। Focus-এর ইংরিজী সমার্থক শব্দ হিসেবে কেউ কেউ hypocentre কথাটি ব্যবহার করে থাকেন (চিত্র : 1.1)।

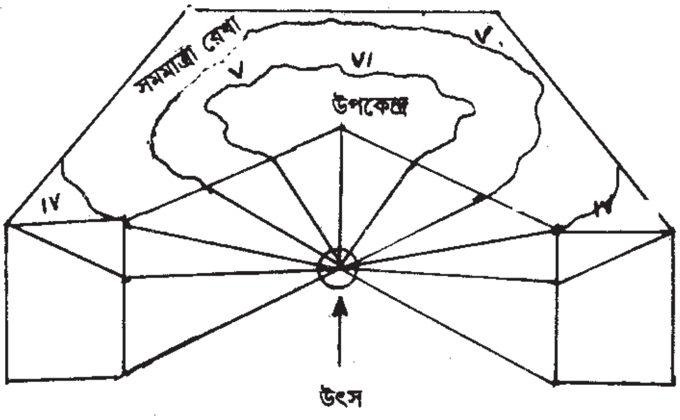

চিত্র 1.1 : *টেক্টনিক্ ভূকম্পের উৎস, উপকেন্দ্র, সমমাত্রা রেখা*

উৎসবিন্দু থেকে যে কোনো তরঙ্গের উৎসের মতো ভূকম্প তরঙ্গ সমকেন্দ্রিক তরঙ্গমুখে বিস্তৃত হয়। ভূগোলকের স্থিতিস্থাপক ধর্ম যদি সমসাত্ত্বিক হতো, তবে তরঙ্গগুলি নিখুঁত গোলকাকৃতি হতো। তরঙ্গমুখ *সমমাত্রা রেখায়* (isoseismal lines) ভূপৃষ্ঠকে ছেদ করে। সমমাত্রারেখাগুলি মোটেই বৃত্তাকৃতি নয়। সেগুলি যেকোনো আকৃতির হতে পারে। তবে, সাধারণভাবে সব রেখাই বদ্ধরেখা (close curves)। কম্পনের শক্তি, যা *ভূকম্পের মাত্রা* রূপে পরিচিত, তা উপকেন্দ্রে চরম এবং উপকেন্দ্র থেকে দূরত্ব বাড়তে বাড়তে ক্রমে কমতে থাকে।

ভূকম্পবিদ্যার (Seismology) শুরু থেকে বিভিন্ন ভূকম্প মাত্রামান (scale of seismic Intensity) প্রস্তাবিত হয়েছে। 1878 সালে রসি (M.S.de Rossi) এবং ফোরেল (F. A. Forrel) যে মাত্রামান প্রস্তাব করেন তা সেযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল। গুণবাচক এই মাত্রামান দশটি মাত্রার। প্রথমটিতে ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি এবং দশমটিতে সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি ধরা হতো। পরবর্তীকালে যখন মাত্রাবাচক ভূকম্পবিদ্যার উন্নতি হল তখন দেখা গেল রসি-ফোরেল মাত্রামান নিতান্তই অনুপযুক্ত। বিশেষ করে যেসব জায়গায় উচ্চমাত্রার ভূকম্পন, সেইসব জায়গায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক মাত্রামানের ভিত্তি ভূকম্পের প্রভাবে জমির ত্বরণের (acceleration) পরিমাণ। এই ত্বরণ বিবৃত হয় ‘g’ (অভিকর্ষজনিত ত্বরণ)-এর অংশরূপে। সূক্ষ্ম যন্ত্রে এগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ হয়। তবে গুণবাচক মাত্রামান এখন ব্যবহৃত হয় ভূকম্পের পর দ্রুত

ক্ষয়ক্ষতির একটি স্থূল প্রাক্-কলনে (estimation)। 1904 সালে ক্যানক্যানি (A. Cancani) প্রথম মাত্রাবাচক ভূকম্প মাত্রামান প্রস্তাব করেন। এটিতে 12টি মাত্রা আছে। (1)-মাত্রায় ত্বরণের পরিমাণ 2×10^{-4} g, (2)-মাত্রায় 5×10^{-4} g, (3)-মাত্রায় 1×10^{-3} g....... (9)-মাত্রায় 0.1 g, (10)-মাত্রায় 0.25 g, (11)-মাত্রায় 0.50 g এবং (12)-মাত্রায় > 0.50 g। 1956 সালে গুটেনবার্গ ও রিখ্‌শ্‌টার্ (Beno Gütenberg এবং C. F. Richter) ভূকম্পমান নির্ধারণের জন্য শিলার ভৌতধর্ম বিবেচনা করে কয়েকটি সমীকরণ প্রস্তাব করেন। যেমন, পৃষ্ঠতরঙ্গের ক্ষেত্রে $Log_{10}(A) + 2.56\ Log_{10}(D)\ 4.67$: যেখানে A = মিলিমিটারে তরঙ্গ বিস্তার, D = কিলোমিটারে উপকেন্দ্রের দূরত্ব। ভূগর্ভস্থ তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁদের সমীকরণটি হল $Log_{10}(A/T) + B(h) - 3$; B = ধ্রুবক, h = ভূকম্প উৎসের গভীরতা।

যে যন্ত্র দিয়ে ভূকম্পের মাত্রাসাপেক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয় সেই যন্ত্রের নাম *ভূকম্প* ***পরিলেখন*** *যন্ত্র* (seismograph)। এরূপ প্রাচীনতম যন্ত্র (136 খ্রীষ্টাব্দ) চোকো সাইস্‌মোমিটার (choko seismometer)। এই যন্ত্রে হালকা শিলার কতকগুলি গোলকের স্থানচ্যুতি দেখে কোনদিক থেকে ভূকম্প তরঙ্গের সঞ্চার ঘটছে তা বোঝা হত। যেকোন বস্তুর স্থিতিজাড্য (inertia of rest) বিঘ্নিত হয় সেটি যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটির বিচলন ঘটলে। এটি যেকোন ভূকম্প পরিলেখন যন্ত্রের মূল সূত্র (principle)। অতি সাধারণ ভূকম্প পরিলেখ যন্ত্রে একটি ভারি স্তম্ভ ভূমিগর্ভে কংক্রিটের সুগভীর ভিত্তির উপর গাঁথা হয়। এই স্তম্ভের উপরের দিক থেকে একটি অস্থিতিস্থাপক তার দিয়ে একটি আনুমানিক কড়ি (beam) এমনভাবে ঝোলানো থাকে যাতে স্তম্ভটির বিন্দুমাত্র বিচলন ঘটলে তা বহুগুণ পরিবর্ধিত হয়ে কড়িটির মুক্ত প্রান্তে আন্দোলন ঘটায়। এই মুক্তপ্রান্তের সঙ্গে লাগানো একটি ঘূর্ণ্যমান চোঙের গায়ে আটকানো একটি কাগজের উপর কড়ির গায়ে লাগানো লেখনীর সাহায্যে ভূকম্প পরিলেখ অঙ্কিত হতো। সাধারণভাবে পরিলেখটি একটি সরলরেখা, কিন্তু, ভূকম্পে তরঙ্গের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সরলরেখাটি দু'দিকে আন্দোলিত হয়ে আঁকাবাঁকা রেখা অঙ্কিত হত (চিত্র : 1.2)। এই পরিলেখ আরো উন্নত করা গেল প্রথমে লেখনীর পরিবর্তে একটি আলোকরশ্মি এবং সাধারণ কাগজের পরিবর্তে একটি আলোক সংবেদনশীল (photosensitive) কাগজ ব্যবহার করে। অত্যাধুনিক যন্ত্রগুলি অবশ্য কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত।

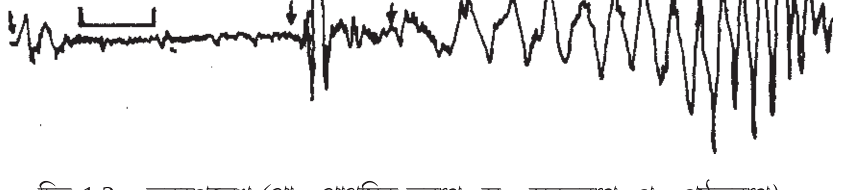

চিত্র 1.2 : *ভূকম্পলেখ (প্রা : প্রাথমিক তরঙ্গ; অ : অনুতরঙ্গ; পৃ : পৃষ্ঠতরঙ্গ)*

যে কোনো পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে অন্তত তিনটি ভূকম্প পরিলেখন যন্ত্র প্রয়োজন। তার মধ্যে দুটি ব্যবহৃত হয় দুটি সমকোণে বিন্যস্ত রেখা বরাবর ভূকম্পের আনুভূমিক অংশ ও অন্যটি ভূকম্পের উল্লম্ব অংশ রেকর্ড করতে।

একই ভূকম্পের জন্য ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহীত ভূকম্প পরিলেখ (seismograph) বিশ্লেষণ করে ভূগোলকের মধ্যে ভূকম্প তরঙ্গের গতিবিধি অনুমান করা যায়। কোন উপকেন্দ্র থেকে গ্রাহক যন্ত্রের দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্প তরঙ্গগুলি বর্ণালী বিশ্লেষণের মতো তিন ধরনের তরঙ্গগুচ্ছে বিশ্লেষিত হয়। প্রথম যে তরঙ্গগুলি আসে সেগুলিকে বলে *প্রাথমিক তরঙ্গ* (primary waves)। ভূকম্পলেখতে প্রাথমিক তরঙ্গ অঙ্কিত হবার পরে কিছুকাল একটি সরলরেখা অঙ্কিত হয়, তারপর কিছুক্ষণ আলোড়ন ঘটে সরলরেখাটির বদলে আঁকাবাঁকা রেখা লিপিবদ্ধ হয়। পরে-আসা এই তরঙ্গগুলিকে *অনুবর্তী তরঙ্গ* (secondary waves) বা অনুতরঙ্গ বলে। এরপর আবার কিছুক্ষণ একটি সরলরেখা অঙ্কিত হবার পর তৃতীয় শ্রেণীর আলোড়ন লিখিত হয়। এগুলিকে *পৃষ্ঠতরঙ্গ* (surface waves) বলে। পরিলেখন কেন্দ্রের দূরত্ব উপকেন্দ্র থেকে যত বাড়ে, তত প্রথম গুচ্ছের আলোড়ন এবং দ্বিতীয় গুচ্ছের আলোড়নের মধ্যে সরলেখাটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। একইভাবে দ্বিতীয় গুচ্ছ ও তৃতীয়গুচ্ছের মধ্যের সরলরেখাটির দৈর্ঘ্যও দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। ভূকম্প পরিলেখর প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল যেকোনো টেক্টনিক্ ভূকম্পের তিনটি তরঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক গতিবেগ প্রাথমিক তরঙ্গের, তারপর অনুতরঙ্গের, আর সবথেকে কম গতিবেগ পৃষ্ঠতরঙ্গের। পৃষ্ঠতরঙ্গের গতিবেগ ন্যূনতম হলেও তার ক্ষয়কারী শক্তির মাত্রা সর্বাধিক। এই পৃষ্ঠতরঙ্গের বিস্তারণপথের ভূপৃষ্ঠ ঠিক জলপৃষ্ঠের মতোই তরঙ্গিত হয়। ফলে তার উপরে উঁচু বাড়ি, গাছপালা সবই মূল বা ভিত্তির দু'পাশে পেন্ডুলামের মতো আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলনের মাত্রা অত্যধিক হলে বাড়িটি কাত হয়ে পড়ে যায়, গাছপালা সমূলে উৎপাটিত হয়। প্রাথমিক ও অনুতরঙ্গকে ভূগোলকের *দেহতরঙ্গ* (body waves) বলে। এগুলির প্রভাবে দুটি সংলগ্ন কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার স্থিতিস্থাপক মানাঙ্কের বস্তুর মধ্যে চিড় ধরে। তখন বাড়িঘরের দেওয়ালের উপরের পলেস্তারা (plaster) খসে পড়ে, জানলা-দরজা দেওয়ালের গাঁথুনির থেকে আলাদা হয়ে যায়। পরে পৃষ্ঠতরঙ্গের সংঘাতে বাড়ি চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে।

ফলিত বলবিদ্যা প্রয়োগ করে প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগের জন্য যে সমীকরণ পাওয়া গেল তা হল :

$$V_1 = \frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}$$

$$V_2 = \frac{\mu}{\rho}$$

এখানে V_1 = প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগ, V_2 = অনুতরঙ্গের গতিবেগ, K = স্থিতিস্থাপকতার আয়তনাঙ্ক (bulk modulus of elasticity); μ = কাঠিন্যের মানাঙ্ক (modulus of rigidity) এবং ρ = বস্তুর ঘনত্ব। প্রাথমিক তরঙ্গ সংকোচন-প্রসারণ তরঙ্গ বলে তার গতিবেগ অনুতরঙ্গের চেয়ে বেশি কারণ অনুতরঙ্গ শুধুই পীড়ন তরঙ্গ।

এই দুটি সমীকরণ থেকে বোঝা গেল যে প্রাথমিক এবং অনুতরঙ্গ ভূগোলকের কাঠিন্য, ঘনত্ব এবং অন্যান্য ভৌতধর্ম প্রাক্-কলনের ভিত্তি। এই দুটি তরঙ্গের বিস্তারণ সম্বন্ধে আরো পরিশীলিত সমীকরণ আবিষ্কারের ফলে শিলাদেহের এবং ভূগর্ভের *ভূ-ভৌত অনুসন্ধান বিদ্যা* (Science of geophysical exploration) উদ্ভূত হল।

তৃতীয়, পৃষ্ঠতরঙ্গা দীর্ঘতরঙ্গা এবং লাভতরঙ্গা (love waves) নামেও পরিচিত। বস্তুত পৃষ্ঠতরঙ্গা র‍্যালে তরঙ্গা (Rayleigh waves), যেগুলির উৎপত্তি ঘটে কঠিন এবং তরল বা বায়বীয় বস্তুর অন্তস্তলে (interface)। ভূপৃষ্ঠের নিচে একটি সংকীর্ণ বলয়ে পৃষ্ঠতরঙ্গোর সঞ্চার সীমাবদ্ধ। ফলে ভূগর্ভে বর্তমান খনি, সুড়ঙ্গা এবং ভূ-ছিদ্রে (boneholes) পৃষ্ঠতরঙ্গোর কোন প্রভাব পড়েনা।

সংকোচন-প্রসারণশীল প্রাথমিক তরঙ্গা একান্তরী প্রসারণ এবং সংকোচনের দ্বারা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিস্তারণের সময় বিস্তারণ পথে কোন ভিন্ন ভৌতধর্মের বস্তু পড়লে তাতে প্রতিফলিত কিংবা প্রতিসরিত হয়। প্রাথমিক তরঙ্গোর বিস্তারণ পদ্ধতি একটি শঙ্খিল (spiral) স্প্রিং মুক্তপ্রান্তে টেনে ছেড়ে দিলে যে ঘটনা ঘটে তার অনুরূপ (চিত্র : 1.3)। অর্থাৎ এটি সর্বৈবভাবে শব্দতরঙ্গোর বিস্তারণের তুল্য এবং কঠিন, তরল ও বায়বীয় বস্তুর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হতে পারে। পীড়ন তরঙ্গা মাধ্যমের আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সঞ্চারিত হয়। একটি সূতো কোথাও আটকিয়ে তার মুক্তপ্রান্ত নাড়ালে যেমনটি ঘটে। ফলে, অনুতরঙ্গোর বিস্তারে স্থিতিস্থাপকতার আয়তনাঙ্ক এবং কাঠিন্যের মানাঙ্কের কোন প্রভাব নেই।

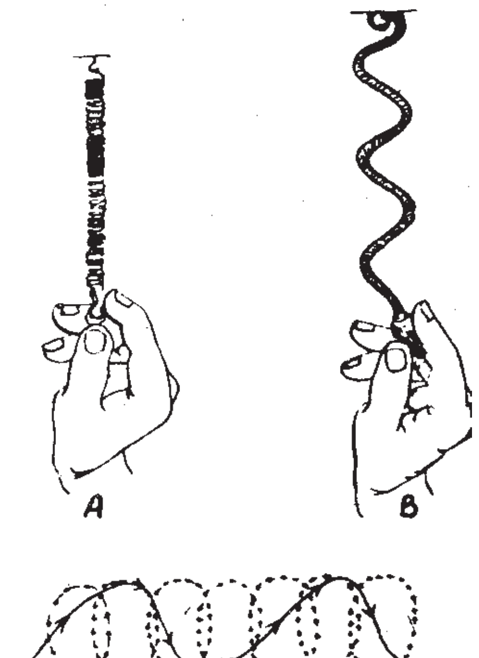

চিত্র 1.3 : *(a : প্রাথমিক তরঙ্গা; b : অনুতরঙ্গা; c : পৃষ্ঠতরঙ্গা)*

পৃষ্ঠতরঙ্গা জলভাগের উপর তরঙ্গোর তুল্য। এটিতে ভূমির প্রত্যেকটি বিন্দু উপবৃত্তের (elliptical) আকৃতির কক্ষপথে আবর্তিত হয়। কিন্তু, তরঙ্গোর শক্তি বিস্তারণ পথে এগিয়ে চলে। উপকেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন দূরত্বে ভিন্নভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে এই তিনটি তরঙ্গোর পৌঁছবার সময়ের মধ্যে ব্যবধান বার করা হয়। যেহেতু প্রাথমিক তরঙ্গোর গতিবেগ অনুতরঙ্গোর গতিবেগের চেয়ে বেশি সেজন্য এ'দুটি তরঙ্গোর আগমন কালের ব্যবধান ভূকম্পের উৎস এবং উপকেন্দ্রের দূরত্বের সূচক। তিনটি

গ্রাহকযন্ত্রে পাওয়া পরিলেখ থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্বের তিনটি মাপ পাওয়া যায়। মানচিত্রে এই তিনটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চলের জন্য যে দূরত্ব পাওয়া গেল, সেই দূরত্বকে ব্যাসার্ধ ধরে তিনটি বৃত্ত আঁকা হয়। সেই তিনটি বৃত্ত পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কের নির্দেশক। এই পদ্ধতিতে, অবশ্য, ধরা হয় যে উৎসবিন্দু এবং উপকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব উভয়ের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে দূরত্বের তুলনায় অনেক কম সেজন্য ER ≅ FR (চিত্র : 1.4)। তবে, প্রাথমিক এবং

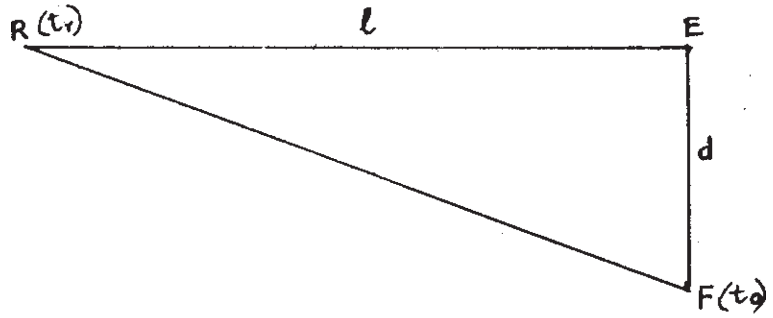

চিত্র 1.4 : উৎসবিন্দুর গভীরতা নির্ণয় (d : উপকেন্দ্র থেকে উৎসের গভীরতা; F : উৎসবিন্দু; E : উপকেন্দ্র; l : উপকেন্দ্র থেকে গ্রাহকযন্ত্রের দূরত্ব; R : গ্রাহকযন্ত্র; (t_0) : ভূকম্পের উৎপত্তিকাল; (t_r) : ভূকম্পলেখনের কাল)

অনুতরঙ্গের উৎপত্তি উপকেন্দ্রে নয়, উৎসবিন্দুতে। সেজন্য, সুগভীর উৎসের ভূকম্পে এই পদ্ধতিতে উপকেন্দ্ররূপে নির্ণীত হয় একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের পরিবর্তে একটি বড় ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চল। উপকেন্দ্র নির্ধারণের আরো অনেক জটিল গাণিতিক এবং ভূভৌত পদ্ধতি আছে এবং সঠিক উপকেন্দ্র নির্ধারণে সব ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়।

রীতিবদ্ধ ভূকম্পবিদ্যার উপকেন্দ্র নির্ধারণের পরবর্তী ধাপ ভূকম্পের উৎসবিন্দু নির্ধারণ। এজন্য একটি সরল সমীকরণ ব্যবহার করা হয় :—

$$\sqrt{d^2 + l^2} = V = (t_r - t_0)$$

এখানে d = উপকেন্দ্র থেকে উৎসবিন্দুর গভীরতা, l = উৎসবিন্দু থেকে পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের দূরত্ব, t_r = প্রত্যক্ষ প্রাথমিক তরঙ্গের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে আগমন কাল, V = প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগ এবং t_0 = ভূকম্পের উৎপত্তিকাল। সঞ্চার-কাল পরিলেখ (travel-time curves) থেকে প্রাথমিক তরঙ্গ এবং অনুতরঙ্গের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পৌঁছবার কালের ব্যবধান প্রয়োগ করে প্রাথমিক তরঙ্গ কতটা পথ পার হয়ে এসেছে তা বার করা যায়। এই পথের দৈর্ঘ্যকে প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগ দিয়ে ভাগ দিলে উৎসবিন্দু থেকে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দূরত্ব বার হয়। সমকোণী ত্রিভুজটির অতিভুজ আর ভূমির মাপ থেকে পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে উৎসবিন্দু থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্ব স্থির করা যায়। এই সরলীকৃত পদ্ধতিতে প্রাথমিক তরঙ্গের সঞ্চারমাধ্যম সমসাত্ত্বিক (homogenous) বলে ধরা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপক অসমসত্ত্বতা বর্তমান থাকায় এই পদ্ধতি একটি পরখী (empirical) হিসেব ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনা।

নথিবদ্ধ সব ভূকম্পের উপকেন্দ্র পৃথিবীর মানচিত্রে স্থাপন করে দেখা গেছে যে উচ্চমাত্রার ভূকম্পের অধিকাংশ ভূপৃষ্ঠে দুটি সুস্পষ্ট রেখা ধরে বিস্তৃত। এর একটি রেখা প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করে এশিয়ার পূর্ব উপকূল এবং আমেরিকার দুটি মহাদেশের পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয়

দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য এই রেখার বাইরে। দ্বিতীয় রেখাটি অ্যাল্পস্ পর্বতমালা এবং হিমালয় পর্বতমালার মধ্য দিয়ে ইয়োরোপের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ভারতবর্ষের পূর্ব দিয়ে দক্ষিণে জাভা, সুমাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথমটিকে বলা হয় *প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূকম্প বলয়,* দ্বিতীয়টি *ভূমধ্যসাগরীয় বলয়* নামে পরিচিত। ভূকম্পবিদ্যার প্রাথমিক অবস্থায় যখন এই দুটি বলয় প্রস্তাবিত হয়েছিল, তখনই দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ সক্রিয় এবং সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এবং যেসব আগ্নেয়গিরি কয়েক কোটি বছর আগেও সক্রিয় ছিল কিন্তু বর্তমানে নিষ্ক্রিয়, এই দুটি বলয়েই প্রধানত বর্তমান। তখন বলা হতো যে মাত্র ৩% উচ্চমাত্রার ভূকম্প এই দুটি বলয়ের বাইরে ঘটে। এবং সেগুলির উপকেন্দ্র প্রধানত পূর্ব আফ্রিকার গ্রস্ত উপত্যকা অঞ্চলের (East African Rift System) মধ্যে সীমাবন্ধ। একটি সামান্য অংশ বিক্ষিপ্তভাবে মধ্য আটলান্টিকের কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জে (যেমন, ট্রিস্তান দা' কুন্‌হা, Tristan de Cunha) ঘটে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেল সুগভীর উৎসের ভূকম্পের এ'দুটি বলয় ছাড়া মাঝারি গভীরতার উৎসের ভূকম্পের উপকেন্দ্র আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের মাঝামাঝি একটি সংকীর্ণ বলয় বিস্তৃত হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছুটা পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে মেক্সিকোর বাহা ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে (Ba a California) প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূকম্প বলয়ের সঙ্গো মিলিত হয়ে গেছে (চিত্র : 1.5)।

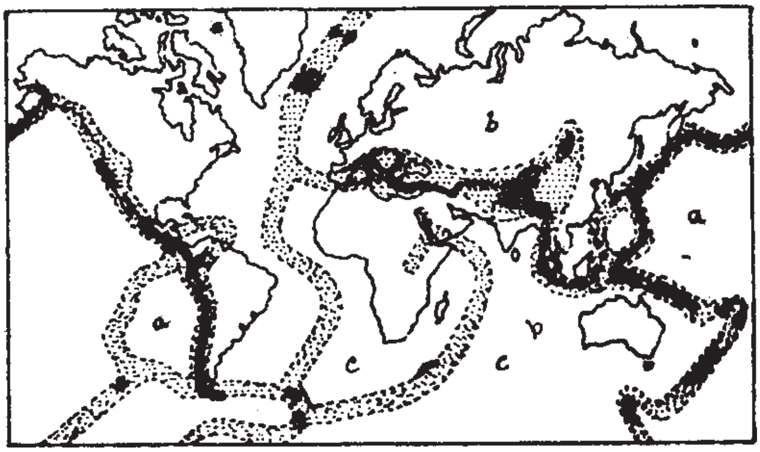

চিত্র 1.5 : ভূকম্পবলয় *(a : প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়; b : আল্পীয়-হিমালয় বলয়; c : মহাসাগরীয় গ্রস্ত উপত্যকা)*

1.4 ভূকম্পের উৎপত্তির কারণ

সভ্যতার উন্মেষের কাল থেকে মানুষ ভূকম্পের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অদ্ভুত সব প্রস্তাব দিয়েছে। প্রথম ব্যতিক্রমী প্রস্তাব এসেছিল গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (384-322 খ্রীষ্টপূর্ব) কাছ থেকে। তিনি অনুমান করেছিলেন ভূগোলকের অভ্যন্তর থেকে বায়ু এবং গ্যাসের নিষ্ক্রমণে বাধা ঘটলে ভূকম্পের উৎপত্তি ঘটে। মধ্যযুগে অ্যারিস্টটলের মতবাদ পরিশীলিত করে বলা হয় যে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে গ্যাসের অভিঘাতে ভূকম্পের উৎপত্তি ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভূকম্পের উৎপত্তির কারণ হিসেবে বলা হয় শিলাদেহে চ্যুতি (faulting) দায়ী। এ সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ জাগায় বাহ্য ক্যালিফোর্নিয়া দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া

রাজ্যের প্রায় উত্তর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত সান অ্যান্ড্রিয়াস চ্যুতিগুচ্ছ। পরে দেখা গেছে যে এই চ্যুতিগুচ্ছ একটি ভূগোলকীয় চ্যুতিবলয়ের অংশ এবং উত্তর আমেরিকার পশ্চিম তটরেখার বিবর্তনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই চ্যুতিবলয় উত্তরে ইউরেকা (Eureka) শহর থেকে সান ফ্রান্সিস্কোর মধ্য দিয়ে মোটামুটি উত্তরপশ্চিম-দক্ষিণপূর্বে গ্রেট জোয়াকুইন উপত্যকার (Great Joaquin valley) দক্ষিণ পর্যন্ত গিয়ে সালটন সাগরের (Salton sea) উত্তর থেকে মেক্সিকোর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই চ্যুতিগুচ্ছে যেকোনো ভূকম্পের সময় শিলাদেহে যে বিচ্যুতি ঘটে তা চ্যুতিটির আয়ামের (strike) সমান্তরাল (Anderson, 1972)।

সান অ্যান্ড্রিয়াস চ্যুতিবলয়ে 1200 কিমি দৈর্ঘ্য ধরে 1906-1946, এই চল্লিশ বছর রীতিবদ্ধ অনুসন্ধান চালানো হয়। কোন কোন অংশে 1906 সালের ভূমিকম্পের আগে এবং পরে নির্দিষ্ট কাল ব্যবধানে ইউ. এস্. কোস্ট অ্যান্ড জিওডেটিক সার্ভে (U. S. Coast and Geodetic Survey) অনুসন্ধান চালায়। পরে জন্স্ হপ্কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইড (H. F. Ride) 1850 সাল থেকে 1906 সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে ঘটা সব ভূকম্পের রিপোর্ট নিয়ে সেগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন :—1851-1865; 1874-1892 এবং 1906-1907। এই তিন শ্রেণীর কালব্যবধানে সান অ্যান্ড্রিয়াস চ্যুতিবলয়ের দু'ধারে শিলাদেহে যা যা বিচ্যুতি ঘটেছে তারও নথিবন্ধ রেকর্ড বিবেচনা করা হয়। তার ফলে এই

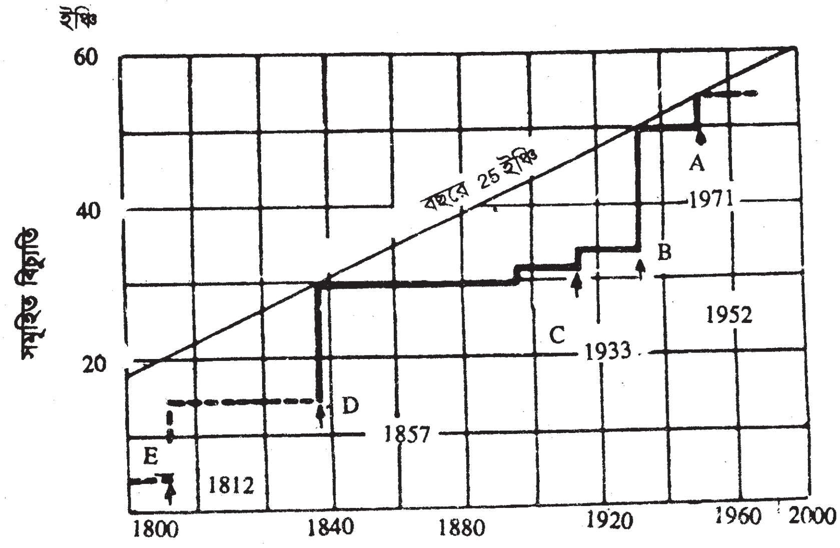

চিত্র 1.6 : সান আন্ড্রিয়াজ চ্যুতিরেখায় পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফল

চ্যুতিবলয় বরাবর বিচ্যুতির ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয় (চিত্র : 1.6)। রাইড বললেন যে, এখানে সমহারে ভূকম্পের শক্তি সঞ্চিত হবার কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন নেই। তবু তিনি অনুমান করলেন, সমহারে না হলেও বেশ কিছুকাল ধরে চ্যুতিবলয়ের দু'ধারের শিলাদেহে শক্তি সঞ্চিত হয়ে চলে যতক্ষণ শিলার সহতামাত্রা (strength) অতিক্রান্ত না হয়। অতিক্রমণ ঘটলেই শিলাদেহটি ছিঁড়ে যায় এবং চ্যুতির দু'পাশের শিলাদেহ তার পূর্ববর্তী জ্যামিতি ফিরে পায়। যে তল বরাবর শিলাদেহটি ছেঁড়ে সেই তলটি হয়ে যায় চ্যুতিতল (fault plane)। ইউ. এস্. কোস্ট অ্যান্ড জিওডেটিক সার্ভে 1907 সাল থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চ্যুতির প্রভাবে চ্যুতিবলয়ের সমকোণে অবস্থিত 18 কিমি দীর্ঘ একটি সরলরেখাকে দুটি বক্ররেখায় পরিণত করেছে। বস্তুত এই সরলরেখাগুলি হল রাস্তা এবং গোচারণভূমির

সীমান্তে গাঁথা তারের বেড়া। 1940 এবং 1952 সালে এখানে প্রবল ভূকম্প ঘটে এবং রাইডের অনুমান সমর্থিত হয়। যেহেতু চ্যুতি সংঘটিত হবার পর শিলাদেহগুলি তাদের স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য পূর্বাবস্থা ফিরে পায় (চিত্র : 1.7) সেজন্য টেক্টনিক্ ভূকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রস্তাব *স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত অনুমিতি* (elastic rebound hypothesis) নামে পরিচিত। সক্রিয় চ্যুতির দু'পাশে নিয়মিত রীতিবদ্ধ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ভূকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব মনে করলেন অনেকে। 1966 সালের 26 এপ্রিল তাশকেন্ট ভূকম্পে তাঁদের অনুমান সমর্থিত হলো।

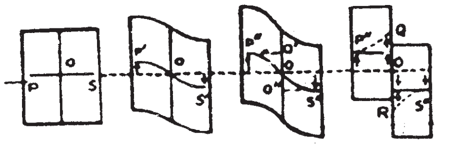

চিত্র 1.7 : *স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত অনুমিতি*

1.5 ভূকম্পের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন ভূকম্পের রেকর্ড থেকে দেখা যায় গভীরতায় 85% ভূকম্পের উৎসবিন্দু গড় সাগরপৃষ্ঠ থেকে ষাট কিলোমিটারের মধ্যে। এগুলিকে বলা হয় *অগভীর উৎসের ভূকম্প*। 12% ভূকম্পের উৎস ষাট থেকে তিনশো কিমি-র মধ্যে। এগুলিকে বলা হয় *মাঝারি উৎসের ভূকম্প*। বাকি 3% ভূকম্পের উৎসবিন্দু তিনশো কিলোমিটারের নিচে। এগুলিকে বলে *গভীর উৎসের ভূকম্প*। পরে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে গড়ে ভূকম্পে উৎপন্ন শক্তির বার্ষিক পরিমাণ 3×10^{15} erg। এগুলির মধ্যে গভীর উৎসের ভূকম্প সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তার কোন কোনটি 10^{27} erg-ও হতে পারে। যে ভূকম্পনগুলির শক্তি নির্ণয় করা গেছে তার একটি সারণি-2-তে দেওয়া গেল।

সারণি-2 : কতকগুলি বড় মাপের ভূকম্পে নির্গত শক্তির সম্ভাব্য মাত্রা

ভূকম্প	তারিখ	নির্গত শক্তি (erg-এ)
লিস্‌বন	1 নভেম্বর, 1755	7×10^{27}
সান ফ্রান্সিসকো	18 জুন, 1906	2×10^{24}
সারেজ (পামির)	18 ফেব্রুয়ারি, 1911	4.3×10^{23}
লস অ্যাঞ্জেলস	10 মার্চ, 1933	1×10^{18}
খাইত (তাজিকিস্তান)	10 জুলাই, 1949	5×10^{24}
আসাম	15 আগস্ট, 1950	3×10^{27}
শেফালোনিয়া (গ্রিস)	12 আগস্ট, 1953	6×10^{24}
অর্লিন্সভিল (আলজেরিয়া)	9 সেপ্টেম্বর, 1954	1×10^{24}
আগাদির (মরক্কো)	1 মার্চ, 1960	1×10^{20}

গোর্শ্কভ্ (1967) সারণি-21, পৃষ্ঠা 448।

1.6 প্রধান প্রধান ভারতীয় ভূকম্প

ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্প বলয় কেন্দ্রীয় হিমালয়ের দক্ষিণে শিবালিক শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। সেজন্য অঞ্চলটিতে ঘন ঘন ভূকম্প ঘটে থাকে। বহু উচ্চমাত্রার ভূকম্প এখানে ঘটেছে, যেমন, 1819, 1830, 1852, 1869, 1885, 1918 এবং 1934 সালে। এই শ্রেণীর দক্ষিণে সিন্ধু-গাঙ্গেয় পাললিক সমভূমি অঞ্চলটি সুগভীর অসংসক্ত (incoherent) পললে গঠিত। ফলে এখানে কোন ভূকম্পের উৎসবিন্দু থাকলেও তার শক্তি আন্তর্কণা বিচলনে প্রশমিত হয়। 1974 সালে ন্যাশনাল জিওফিজিকাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের বিজ্ঞানী দেশিকাচার দেখিয়েছেন, যে, সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির নিচে বেশ কয়েকটি সক্রিয় চ্যুতি বর্তমান। বিন্ধ্য-মৈকাল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে 1967 সালের কয়না ভূকম্পের আগে উচ্চমাত্রার ভূকম্পের কোন ইতিহাস পাওয়া যায়না। তাই মনে করা হত যে অঞ্চলটি টেক্‌টনিক্‌ভাবে নিষ্ক্রিয়। কয়না ভূকম্প এবং পরবর্তীকালে লাতুর ভূকম্প এই ধারণা সংশোধন করেছে।

কয়না ভূকম্প 11 ডিসেম্বর, 1967 :

1967-এর কয়না ভূকম্প বিগত বারোশো বছরে তৃতীয় ভূকম্প। ওই বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে 5.7 মাত্রার দুর্বল ভূকম্পন অনুভূত হতে থাকে। ডিসেম্বরে মূল ভূকম্প ঘটে। কয়নানগর বাঁধের 700 কিমি ব্যাসার্ধের সর্বত্র এই ভূকম্প অনুভূত হয়েছিল এবং উপকেন্দ্র কয়নানগরে তার মাত্রা ছিল 8.5। সমস্ত পাকা বাড়ি এবং মাটির বাড়ি বাঁধের 10 কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবে কংক্রিটের বাড়ি, ইলেকট্রিক এবং টেলিফোনের পোস্ট এবং পাইপলাইন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়ির ছাদ ধসে পড়েছিল।

ভূবিজ্ঞানীরা এই ভূকম্পের বিভিন্ন কারণ অনুমান করেন। ভূকম্পের পর নিকটবর্তী উষ্ণ প্রস্রবণের তাপমাত্রা লক্ষণীয় ভাবে বেড়ে যায়। কোঙ্কনের উষ্ণ প্রস্রবণের তাপমাত্রা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। কোঙ্কনের উষ্ণ প্রস্রবণ এবং কাম্বে ও আংকলেশ্বরের অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের তৈল-কূপগুলিতে ভূতাপীয় অবক্রম বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেকে অনুমান করেন যে, এটি এখানে ভূগর্ভে ম্যাগমার ক্রিয়ার নিদর্শন। পরবর্তীকালে ভূভৌত পর্যবেক্ষণের ফলে এখানে অনেকগুলি সক্রিয় চ্যুতিতল এবং পীড়নতল ধরা পড়ে। ফলে ভারতীয় উপদ্বীপ যে ভূকম্পহীন অঞ্চল, সেই প্রচলিত ধারণা পরিত্যক্ত হয়। চ্যুতিগুলির মধ্যে একটি 540 কিমি দীর্ঘ। কয়না চ্যুতি নামে পরিচিত এই চ্যুতিটি কালাদগিতে শুরু হয়ে কয়নানগরের মধ্যে দিয়ে নাসিকের 60 কিমি পশ্চিমে শেষ হয়েছে। কৃষ্ণব্রহ্মণ ও নেগি (1973) অনুমান করেন যে, কয়না চ্যুতিতে বিচলন ঘটে এই টেক্‌টনিক্‌ ভূকম্প উৎপন্ন হয়। যদিও চ্যুতিটি প্রাক্‌-ক্যাম্ব্রীয় কালের, তবু সম্ভবত এটি আধুনিক কালে সক্রিয় হয়েছে। ভূ-ভৌতবিদদের মতে, কয়না ভূকম্প ডেকান ট্র্যাপের আবরণের নিচে শিলার টেক্‌টনিক্‌ গঠন সম্বন্ধে বহু তথ্য সরবরাহ করবে।

আসাম ভূকম্প 15 আগস্ট, 1950 :

ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে ভারত, তিব্বত এবং চীনের সাধারণ সীমানায় রিমার কাছে ছিল এই ভূকম্পের উপকেন্দ্র। এখানে ভূকম্পের মাত্রা 8.7। জনবসতি বিরল হওয়ায় 1897-এর আসাম

ভূমিকম্পের তুলনায় লোকক্ষয় কম হলেও ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন ঘটে। যারা এসময়ে বিমানে এখান দিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই ভূমিপৃষ্ঠে পরিবর্তন ঘটতে দেখেছেন। পাহাড়ে বড় ধরনের ধস নামে। এফ কিংডন-ওয়ার্ড নামে একজন উদ্ভিদবিদ এই ভূকম্পের একমাত্র প্রত্যক্ষ বিবরণ দেন। পরে দেখা যায় যে এই ভূকম্পে উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ একলক্ষ পারমাণবিক বোমার শক্তির সমান।

কোয়েটা ভূকম্প 31 মে, 1935 :

এই ভূকম্পের উপকেন্দ্র ছিল কোয়েটা থেকে মাস্‌তুং পর্যন্ত 90 কিমি বিস্তৃত একটি সংকীর্ণ বলয়। 2,59,000 বর্গ কিলোমিটারে ভূকম্পটি অনুভূত হয়েছিল। ভূকম্পের মাত্রা ছিল 7.6। উৎসবিন্দুর সঠিক গভীরতা নিরূপণ করা যায়নি। অনুমান করা হয় এটি একটি অগভীর উৎসের ভূকম্প।

বিহার-নেপাল ভূকম্প, 15 জানুয়ারি, 1934 :

ভারতের ইতিহাসে প্রবলতম ভূকম্পগুলির একটি। এটি অনুভূত হয়েছিল প্রায় 39,50,000 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এবং অন্তত 10,000 মানুষ মারা গিয়েছিল। এখানে উপকেন্দ্রটি 120 কিমি দীর্ঘ একটি বলয়ে মতিহারির পূর্ব থেকে সীতামারি হয়ে মধুবনি পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূকম্পের ফলে রেলওয়ে বাঁধগুলি এবং পথঘাট দুই মিটার পর্যন্ত ভূগর্ভে ঢুকে যায়। মার্কালি মাত্রামানে (Mercalli) এই ভূকম্পের মাত্রা ছিল দশ। এবং এই মাত্রা 120 কিমি দীর্ঘ এবং 30 কিমি বিস্তৃত একটি অঞ্চলে সর্বত্র অনুভূত হয়েছিল।

আসাম ভূকম্প, 12 জুন, 1897 :

এর উপকেন্দ্র ছিল শিলং উপত্যকায় এবং প্রভাবিত অঞ্চলের আয়তন 36,50,000 বর্গ কিমি। শিলং, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ এবং সিলেটে পাথরে তৈরি সব বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর. ডি. ওল্ডহ্যাম লিখেছেন যে, নরম জেলির মতো জমি বিভিন্ন দিকে প্রকম্পিত হতে হতে দীর্ঘ ফাটল উৎপন্ন হয়। জলাধারের চারপাশ থেকে ফাটল বরাবর ভূমি নেমে আসে। 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ব্রহ্মপুত্রের দুটি প্রধান উপনদী মানস এবং পাগলাদিয়ার অববাহিকায়। এই ভূকম্পের প্রভাব কিন্তু কলকাতাতেও পড়েছিল।

বাংলাদেশের ভূকম্প, 14 জুলাই, 1885 :

এটির উপকেন্দ্র ছিল ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে এবং 5,98,000 বর্গ কিমি এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়। রিপোর্টে দেখা যায় বহু জায়গা বসে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং অন্যান্য নদীর জলে প্লাবিত হয় এবং পরে সেগুলি জলাভূমিতে পরিণত হয়।

কচ্ছ ভূকম্প, 16 জুন, 1819 :

যদিও এই ভূকম্প 1897 এবং 1934 সালের ভূকম্পের তুলনায় কম আয়তনের অঞ্চলে অনুভূত হয়েছিল তবু সুদূর কলকাতায় এজন্য কম্পন অনুভূত হয়। প্রায় 100 কিমি দীর্ঘ একটি অঞ্চল উঠে পড়ে সিন্ধুনদীর একটি শাখা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নদীর জলে বিস্তৃত এলাকা প্লাবিত হয়। যদিও এই অঞ্চলের ইতিহাসে এটিই প্রথম ভূকম্প, তবে পরবর্তীকালে বহুবার মৃদু কম্পন ঘটেছে। 1956 সালের 21 জুলাই একটি মাঝারি মাত্রার ভূকম্পন ঘটে।

উত্তরকাশী-চামোলি, 19 অক্টোবর, 1991 এবং 28 মার্চ, 1999 :

উত্তরকাশী চামোলি অঞ্চলে এই দু'বার উচ্চমাত্রার ভূকম্পন ঘটে। প্রথমটির উপকেন্দ্র 34°48' উ ও 78°48' পূ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে। দুটিই অগভীর উৎসের ভূকম্প (যথাক্রমে 10 ও 15 কিমি)। কিন্তু প্রথমটির তীব্রতা রিখ্‌টার মাত্রাক্রমে 7 ও পরেরটির 6.6। 1980 সাল থেকে প্রায়ই হিমালয়ের পার্বত্য বলয়ে ভূকম্পন ঘটে আসছে। তীব্রতা সাধারণভাবে 6 থেকে 7 এর মধ্যে। উপকেন্দ্রগুলিকে মানচিত্রে সন্নিবেশ করলে মনে হয় ভারতীয় প্লেটের তিব্বতীয় প্লেটের নীচে সঞ্চার এইসব ভূকম্পের কারণ। তবে 6 আগস্ট, 1998-এর ভূকম্প এর ব্যতিক্রম। গৌহাটির কাছে উপকেন্দ্র (25°6' উ, 95°6' পূ) এবং উৎসের 100 কিমি গভীরতা হিমালয়ের পরিবর্তে বেঙ্গল বেসিনের পূর্বে বর্মী প্লেটের অধোগমনের নির্দেশক।

লাটুর-ওসমানাবাদ, 29 সেপ্টেম্বর, 1993 :

6.3 তীব্রতার এক ভূকম্পে ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্য-পশ্চিমে লাটুর, ওসমানাবাদ এবং কিলারির চারপাশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। মাত্র 6 কিমি গভীরতার উৎসের এই ভূকম্প নর্মদা গ্রস্ত উপত্যকার কাছাকাছি। সম্ভবত এটিও কয়না ভূকম্পের মতো দাক্ষিণাত্যের শিল্ড্ অঞ্চলে টেকটনিক ক্রিয়ার পুনরুন্মেষের ইঙ্গিতবহ।

ভূজ-অঞ্জর, 26 জানুয়ারি, 2001 :

আমেদাবাদ, অঞ্জর এবং ভুজ অঞ্চল এক ভয়াবহ ভূকম্পে বিপর্যস্ত হয়। এর উপকেন্দ্র 23.326° উ ও 70.317° পূ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে, উৎসের গভীরতা 23 কিমি এবং তীব্রতা রিখ্‌টার মাত্রাক্রমে 7.5।

আমেদাবাদে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি থেকে মনে হয় এই ভূকম্পের সম্ভাব্য কারণ সবরমতী গ্রস্ত উপত্যকার চ্যুতি। বিংশ শতকের আশির দশকে আংকলেশ্বরের তৈল কূপে অত্যুষ্ণ জলীয় বাষ্পের বিস্ফোরণ এই অনুমানের সমর্থক। ভারতের পশ্চিম উপকূল উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্মারক টেকটনিক চ্যুতির পুনর্জাগরণের ফলে এই ভূকম্প ঘটে থাকতে পারে। ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই সম্ভাবনা সত্য প্রমাণিত হলে বর্তমান শতকে উত্তর ভারতে ব্যাপক ভূকম্পের সম্ভাবনা এবং পূর্ব আরবসাগরে কোথাও কোথাও অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা আছে।

1.7 ভূগোলকের অভ্যন্তরীণ গঠন

গভীরতম ভূছিদ্র ভূগর্ভে মাত্র 10 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি স্কুলের গ্লোবে এটি উপরের বার্নিশ এবং রঙের আস্তরণের চেয়েও পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় কম বেধ-এর। সুতরাং পৃথিবীর গভীরে কী ধরনের বস্তু আছে তা নিরূপণ করার জন্য পরোক্ষ নিদর্শনের সাহায্য নিতে হয়।

এ সম্বন্ধে মানুষের প্রাচীনতম নিদর্শন ছিল আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত তরল পদার্থ। অনুমান করা হয়েছিল যে, ভূগোলকের অভ্যন্তর তরল পদার্থে তৈরি। এই ধারণা মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অনুমান করা হয় যে, তার উপরে ক্রমে শীতল হওয়ায় তরল বস্তুটি ঘনীভূত হয়ে ভূত্বক সৃষ্টি হয়। এই ভূত্বকের তুলনা করা হত আপেলের শুকিয়ে যাওয়া খোসার সঙ্গে। যাঁরা এসম্বন্ধে প্রতিবাদ করলেন তাঁরা

বললেন, চন্দ্র এবং সূর্যের আকর্ষণে যেমন জলভাগে জোয়ার-ভাটা ঘটে তেমনি পৃথিবীর অভ্যন্তর তরল হলে সেখানেও জোয়ার-ভাটা ঘটবে। ফলে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র কোথাও না কোথাও ভূকম্প ও অগ্ন্যুচ্ছাস ঘটবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিশেল দেখালেন যে ভূগোলকের মধ্য দিয়ে ভূকম্পের শক্তি তরঙ্গারূপে সঞ্চারিত হয়। 1892 সালে মিল্‌নে (Milney) প্রথম ভূকম্প পরিলেখন যন্ত্র (Seismograph) তৈরি করেন। তখন দেখা গেল প্রাথমিক এবং অনুতরঙ্গা—দু'টিই গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো ত্বরিত হয়। তরঙ্গা-বলবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে প্রতিসরণের যে সমীকরণ পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় :

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{ধ্রুবক} = \frac{V_1}{V_2}$$

এখানে i হল আপতন কোণ, r হল প্রতিসরণ কোণ, V_1 আপতন মাধ্যমে তরঙ্গোর গতিবেগ, V_2 প্রতিসরণ মাধ্যমে তরঙ্গোর গতিবেগ। সুতরাং, পরপর ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের স্তর থাকলে ভূকম্প তরঙ্গোর গতিবেগ হবে এরূপ : $V_1 < V_2 <$........., যার অর্থ $\sin i_1 < \sin r_1 (= \sin i_2) < \sin r_2 (= \sin r_3)$........ অর্থাৎ তরঙ্গোর গতিপথ সরলরেখা নয় এবং এটি ক্রমশঃ বেঁকে গিয়ে উপকেন্দ্র থেকে কোন দূরবর্তী স্থানে ভূপৃষ্ঠকে ছেদ করবে (চিত্র : 1.8)। ভূকম্পের রীতিবদ্ধ অনুসন্ধানে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলি উপকেন্দ্র থেকে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী স্থানে তরঙ্গাগুলিকে রেকর্ড করে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভূকম্পলেখ থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক এবং অনুতরঙ্গা ছাড়া সেগুলির প্রতিফলিত অনেকগুলি উপাংশ (component)

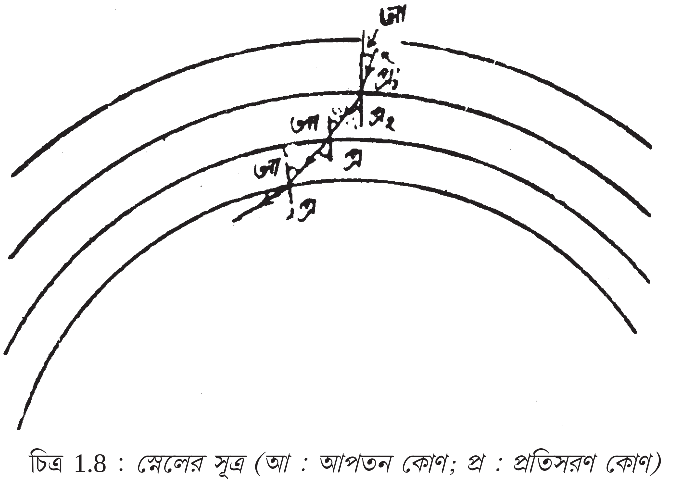

চিত্র 1.8 : *স্নেলের সূত্র (আ : আপতন কোণ; প্র : প্রতিসরণ কোণ)*

ভূকম্পলেখতে ধরা পড়ে। এগুলি প্রাথমিক তরঙ্গা 1-2 অথবা ইংরিজীতে PKP, PKIKP ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করা হয়।

ভূকম্পবিদ্যা যত উন্নত হতে লাগল, তত অধিকসংখ্যক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে যে কোনো বিশেষ ভূকম্পের ভূকম্পলেখ গৃহীত হল। এরূপ বহু ভূকম্পলেখ বিশ্লেষণ করে দেখা গেল উপকেন্দ্র থেকে 1150 কিমি দূরে হঠাৎ প্রাথমিক এবং অনুতরঙ্গা—দু'টিরই গতিবেগ অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে। এই আকস্মিক বৃদ্ধির পর 11,500 কিমি পর্যন্ত তরঙ্গাই ক্রমান্বয়ে ত্বরিত হতে হতে 11,500 কিমির পর হঠাৎ দুটি তরঙ্গাই অদৃশ্য হয়ে গেল। উপকেন্দ্র থেকে 16,000 কিমি দূরত্বের পর প্রাথমিক তরঙ্গাটি আবার

পাওয়া গেল; কিন্তু তার গতিবেগ অনেকটা কমে গেছে (চিত্র : 1.9)। এই নব্য পর্যায়ের প্রাথমিক তরঙ্গ ক্রমাগত ত্বরিত হতে হতে উপকেন্দ্রের প্রতিপাদ বিন্দু পর্যন্ত অব্যাহতভাবে পরিলিখিত হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোনো বড় মাপের টেক্‌টনিক্ ভূকম্পে প্রায় 5000 কিমি বিস্তৃত একটি অঞ্চলে প্রাথমিক বা অনুতরঙ্গ—কোনটিই ধরা পড়েনা। এই বলয়টির নাম দেওয়া হয়েছে ছায়াবলয় (shadow zone)।

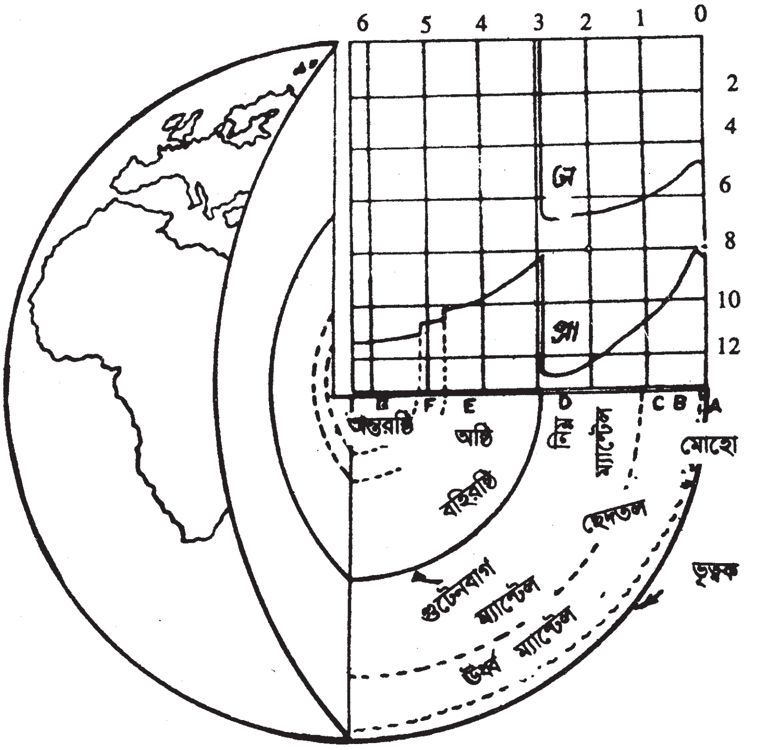

চিত্র 1.9 : *ভূগোলকের আভ্যন্তরীণ গঠন*

(A B C D E F G ইত্যাদি যথাক্রমে ভূত্বক, অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ার ইত্যাদির আন্তর্জাতিক প্রতীক)

এভাবে হঠাৎ দেহতরঙ্গাদুটির গতিবেগ বৃদ্ধি থেকে ভূগর্ভে প্রথম ছেদ-তল নির্ণীত হয়। যে যুগোশ্লাভ ভূকম্পবিদ 1909 সালে এটি আবিষ্কার করেন, তাঁর নামে এই ছেদতলটির নাম দেওয়া হয় *মোহোরোভিসিক ছেদতল*। ভূপৃষ্ঠে 11,500 কিমি ব্যবধান নির্দেশ করে ভূগর্ভে 2,900 কিমি গভীরতা। এই গভীরতায় আর একটি ছেদতল প্রথম অনুমিত হয় 1899 সালে এবং পরে প্রমাণিত হয় 1906 সালে (R. D. Oldham) এবং 1913 সালে (Gütenberg)। এই ছেদতলটি *গুটেনবার্গ ছেদতল* নামে পরিচিত। উপরের ছেদতলটি সংক্ষেপে *মোহো* নামে পরিচিত। মোহোর উপরে ভূগোলকের সমকেন্দ্রিক খোলকটিকে বলে *ভূত্বক* (crust of the earth)। মোহো থেকে গুটেনবার্গ ছেদতল পর্যন্ত সমকেন্দ্রিক অংশটিকে বলা হয় *পৃথিবীর ম্যান্টেল* (mantle of the earth)। গুটেনবার্গ ছেদতল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত অংশটিকে বলা হয় *ভূগোলকের অস্থি* (core of the earth)। অনুতরঙ্গ ভূগোলকের অস্থি পার হয়ে যেতে পারেনা দেখে অনুমান করা হয়েছিল যে ভূগোলকের অস্থি তরল অবস্থায় আছে।

1.7.1 ভূত্বক

পৃষ্ঠতরঙ্গোর বিস্তারণ দেখে ভূত্বকের অসমসত্ত্বতার সম্বন্ধে প্রথম অবহিত হওয়া যায়। দেখা গেল যে, টোকিওর কাছে উপকেন্দ্র, এমন ভূকম্পের পৃষ্ঠতরঙ্গা প্রশান্ত মহাসাগরের অপরদিকে সান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছয় মস্কোর তুলনায় বেশ কিছুটা আঘে। অথচ, টোকিও থেকে সান ফ্রান্সিসকো এবং মস্কোর দূরত্ব সমান। কেবল টোকিও ও সান ফ্রান্সিসকোর মধ্যে বর্তমান মহাসাগরীয় ভূত্বক আর টোকিও ও মস্কোর মধ্যে বর্তমান ভূভাগীয় ভূত্বক। সুতরাং, মহাসাগরীয় ভূত্বক এবং ভূভাগীয় ভূত্বকের শৈল উপাদানে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেল ভূভাগীয় ভূত্বকের পৃষ্ঠতরঙ্গোর গতিবেগ গ্রানাইট, বেলেপাথর, কাদাপাথর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার গতিবেগের সমান। অন্যদিকে মহাসাগরীয় ভূত্বকে পৃষ্ঠতরঙ্গোর গতিবেগ বেসল্টের মধ্য দিয়ে তার গতিবেগের সমান। বিজ্ঞানীরা বললেন, ভূভাগীয় শিলার প্রধান রাসায়নিক উপাদান সিলিকন এবং অ্যালুমিনিয়াম। এই দুটি মৌলের রাসায়নিক সংকেতের প্রথম দুটি অক্ষর নিয়ে ভূভাগীয় শিলাগোষ্ঠীর নাম দেওয়া হল সিআল (sial)। বেসল্ট প্রধানত সিলিকন এবং ম্যাগনেসিয়াম মৌলের শিলা। এই দুটি মৌলের প্রথম অক্ষরদুটি নিয়ে মহাসাগরীয় শিলাগোষ্ঠীর নামদেওয়া হল সিমা (sima)। ভূত্বকের সর্বত্র সিআল আর সিমা এই দুই শিলাগোষ্ঠীর স্তর আছে। ভূভাগের নিচে সিআল অনেক বেশি পুরু আর সাগরগর্ভে সিমা অনেক বেশি পুরু। এই দুই গোষ্ঠীর শিলাস্তরের মধ্যে যে ছেদতল তার নাম দেওয়া হল কোন্‌রাড ছেদতল (Conrad discontinuity)।

1.7.2 পৃথিবীর ম্যান্টেল

ভূকম্পবিদ্যার উন্নতির সঙ্গো সঙ্গো দেখা গেল যে, মোহোর ঠিক নিয়ে দেহতরঙ্গোর গতি আকস্মিক বৃদ্ধি পেলেও প্রায় 60 কিমি নীচে গিয়ে তার গতিবেগ 6% কমে যাচ্ছে। এই 60 কিমি থেকে 250 কিমি গভীরতা পর্যন্ত যদিও এই দুই তরঙ্গা ত্বরিত হলেও এই ত্বরণের হার আগের তুলনায় অনেক কম। বেনো গুটেনবার্গ প্রথম এরূপ একটি স্বল্প গতিবেগ অঞ্চলের কথা বলেছিলেন এবং অনুমান করেন যে গড়ে 150 কিমি গভীরে এই অঞ্চলটি বর্তমান। 1960 সালের 22 মে চিলির ভূকম্প বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে এই স্বল্প গতিবেগ অঞ্চল সমগ্র ভূগোলকব্যাপী বর্তমান। এটির নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাস্‌থেনোস্পিয়ার। অনুমান করা হয় যে অত্যধিক তাপমাত্রায় যদিও অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ারে শিলা গলিত অবস্থায় থাকার কথা তবু উপরের বিপুল চাপে তার গলনাঙ্ক অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে তাপমাত্রার প্রভাব শুধু শিলার দৃঢ়তা হ্রাসে সীমাবদ্ধ। একইসঙ্গো অনুমান করা হল যে, কোন কারণে যদি একটি গভীর ফাটল উৎপন্ন হয়, তবে সেই ফাটলের নীচে অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ার গলে বেসল্টের সংযুতির ম্যাগমা (magma) সৃষ্টি হবে। এই তত্ত্বীয় মডেলের সমর্থন পাওয়া গেল 1957 সালে ভূবিজ্ঞানী গোর্‌শ্‌কভ-এর পর্যবেক্ষণে। তিনি দেখলেন যে, সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্বে কামচাটকা উপদ্বীপে এমন কোন ভূকম্পের অনুতরঙ্গা ধরা পড়েনা যার উপকেন্দ্র জাপানে। তাঁর মতে, জাপান এবং এই উপদ্বীপের মধ্যে আছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয়গিরি বলয় (Pacific girdle of fire)। তার নীচে অহরহ ম্যাগমার উৎপত্তি ঘটছে। ফলে কোন অনুতরঙ্গা এই বলয়টি পার হতে পারেনা। গোর্‌শ্‌কভ-এর মতে ম্যাগমার উৎপত্তি ঘটে 55 কিমি গভীর অঞ্চলে। পরে অবশ্য দেখা গেছে ম্যাগমার উৎস 400 কিমি পর্যন্ত গভীরতায় হতে পারে।

আন্তর্জাতিক ভূ-ভৌত বর্ষে (International Geophysical Year) বহির্বিশ্বে প্রথম মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয়। তারই পাশাপাশি একটি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল মোহো পর্যন্ত ভূ-ছিদ্রণের। এটি অবশ্য সফল হয়নি। বিপুল অর্থব্যয়ের পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে বিজ্ঞান যতটা এগিয়েছে, প্রযুক্তি ততটা এগোয়নি। মোহো কর্মসূচী পরিত্যক্ত হল, তার পদলে এল উর্ধ্ব-ম্যান্টেল কর্মসূচী (Upper Mantle Project)। মোহো থেকে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বলা হয় উর্ধ্ব ম্যান্টেল। ভূত্বক থেকে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে শিলামন্ডল (lithosphere)। অর্থাৎ মোরোভিসিক ছেদ শিলামন্ডলেরই একটি অংশ এবং বর্তমানে নিষ্ক্রিয় (inactive)। অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের গলিত অবস্থার জন্য দায়ী তার অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা। বিজ্ঞানীদের মতে, এই তাপমাত্রার কারণ এখানের তেজষ্ক্রিয় মৌলের (radioactive elements) সর্বাধিক সমাবেশ। গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে উর্ধ্ব ম্যান্টেলের উপরের শিলার মতো দৃঢ় শিলা যে ভিতরে আর কোথাও নেই সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ক্রমে একমত হলেন। তাঁরা দেখলেন, শিলামণ্ডলে প্রথম 100 কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগ সেকেন্ডে 4 কিমি-এর কম থেকে বেড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল 8.3 কিমি। কিন্তু পরবর্তী 900 কিলোমিটারে তা হয়ে দাঁড়াল 11.4 কিমি। অর্থাৎ বৃদ্ধি মাত্র 3.1 কিমি। বস্তুর দৃঢ়তা কমে গেলেই শুধু তা হওয়া সম্ভব। তবে বস্তুর ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে সম্ভবত পৌঁছে গেছে 4.64-এ।

গড় সাগরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 100 কিমি নিচে নিম্ন ম্যান্টেলের শুরু। দেখা গেল নিম্ন ম্যান্টেলে প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগ বাড়তে বাড়তে 13.7 কিলোমিটারে পৌঁছে হঠাৎ নেমে গেল 8.2 কিলোমিটারে। ঘনত্ব কিন্তু বেড়ে হচ্ছে 9.71। চাপ প্রায় 136,800 কোটি বার-এ (1 বার = নর্মাল অ্যাট্মস্ফিয়ারিক প্রেশার)। বিগলন চুল্লী থেকে নিষ্কাশিত ধাতুমলে (slag) পাওয়া বস্তুর গঠন থেকে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন এখানে ক্যালসিয়াম ফেরাইট গঠনের মণিকের অস্তিত্বের কথা। ধাতুসংকর নয়, দুটি ইলেকট্রোপজিটিভ মৌলের সংযোগে উৎপন্ন একটি যৌগ। দুটি ইলেকট্রোনেগেটিভ মৌলের সংযোগে উৎপন্ন যৌগের কথা অবশ্য রসায়নবিদ্যায় জানা। যেমন নাইট্রাস অক্সাইড। কিন্তু এইসব গ্যাসীয় যৌগ থেকে দুটি ধাতুর সংযোগে উৎপন্ন যৌগের সম্ভাব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণা করা গেলনা।

ভূগোলকের গঠন সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেল উল্কাপিণ্ড থেকে। অনুমান করা হয়, এগুলি মহাবিশ্বে ভাসমান শিলাখণ্ড, ভূগোলকের সৃষ্টির আগে মহাজাগতিক বস্তুকণার সমবায়নে তৈরি। উল্কাপিণ্ড অবশ্য মানুষের কাছে নতুন নয়, কিন্তু তা মহাজাগতির বস্তুখণ্ডের জারিত (oxidized) অবশেষ মাত্র। এগুলি ভূপৃষ্ঠে পড়ার সময় বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে উৎপন্ন অতি উচ্চতাপে সীসক এবং যাবতীয় উদ্বায়ী বস্তু হারিয়ে ফেলেছে। তবে মহাকাশযানে সংগৃহীত উল্কাপিণ্ডে সে সমস্যা নেই। উল্কাপিণ্ড বিভিন্ন ধরনের। সেগুলির রাসায়নিক সংযুতি, তার মধ্যে মণিক উপাদান এবং সেগুলির গ্রথন (texture) পরিচিত শিলা থেকে আলাদা হলেও শিলাবিদ্যার পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেগুলির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। শিলামণ্ডল, ম্যান্টেল এবং ভূগোলকের অষ্ঠি (core)—এই তিনটির অনুরূপ রাসায়নিক এবং মণিক সংযুতি প্রধান তিন ধরনের উল্কাপিণ্ডের। ভূগোলকের গভীরে ধাতব অষ্ঠীর সম্ভাবনা প্রস্তাবিত হয় লোহা-নিকেল (sederite) এবং নিকেল-লোহা (sederolite)—এই দুই সংযুতির উল্কাপিণ্ডের ভিত্তিতে।

1.7.3 ভূগোলকের অস্থি

তবে নিম্ন ম্যান্টেলের নিম্নসীমা ধরা গেল ভূকম্পতরঙ্গের সঞ্চার বিশ্লেষণ করে। দেখা গেল গড় সাগরপৃষ্ঠ থেকে 2,898 কিমি নিচে গিয়ে প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগ হঠাৎ 13.7 থেকে নেমে যাচ্ছে 8.2 কিলোমিটারে। এই সঙ্গে অনুতরঙ্গ হারিয়ে যাচ্ছে, যা ঘটতে পারে শুধু সঞ্চার মাধ্যম তরল অবস্থায় থাকলে। কিন্তু এই চাপে তরল বলতে আমরা যা বুঝি, সে অবস্থা কোনমতে সম্ভব নয়। ফলিত বলবিদ্যার প্রয়োগে জানা গেল, যে-বস্তুর দৃঢ়তা (rigidity) নেই, তার মধ্য দিয়ে অনুতরঙ্গের সঞ্চার সম্ভব নয়। কোন তরল বস্তুরই দৃঢ়তা বা rigidity নেই। কাচেরও rigidity নেই, কিন্তু কাচ তরল বস্তু নয়। 2898 কিমি নিচে ভূগোলকের ভৌত অবস্থাটি বাস্তবিকই আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ্য কোন অবস্থা নয়। কোন বিজ্ঞানীর অসতর্ক মুহূর্তে এই গাণিতিক অবস্থাটি অতি সরল করে বলা হল যে ভূগোলকের তরল অভ্যন্তর।

ভূগোলকের ব্যাসার্ধ 6,391 কিমি ধরলে গুটেনবার্গ ছেদতলের নীচে অস্থির ব্যাসার্ধ দাঁড়ায় 3.493 কিমি। এই সুবিশাল গোলকের প্রকৃতি নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা বড় রকমের বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। এতবড় গোলকের সবটাই কি দৃঢ়তা বিহীন? লেভিন 1972 সালে বললেন যে তা নয়। তিনি দেখালেন, 4,992 থেকে 5,121 কিমি পর্যন্ত মাত্র 29 কিলোমিটারের ব্যবধানে প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগ 10.4 থেকে বেড়ে হচ্ছে সেকেন্ডে 11 কিমি। এই অঞ্চলে সম্ভাব্য চাপ 318,000 কোটি বার। সুতরাং, এখানে বস্তুর দৃঢ়তা নীচের বা উপরের তুলনায় অনেক বেশি। উপরে প্রায় 2000 কিলোমিটারে প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবেগ বেড়েছিল সেকেন্ডে 1.4 কিমি। আর এই অঞ্চলের নীচে প্রায় 1200 কিলোমিটারে তা বাড়ছে 1.3 কিমি। মাঝের এই 29 কিমি একটি পরিবৃত্তী অঞ্চল (transition zone)। কারো কারো মতে এটিও একটি ছেদতল। তাঁরা উপরের অংশটিকে বলেন বহিরাস্থি (outer core), আর নীচের অংশটিকে বলেন অন্তরস্থি (inner core)। এই ছেদতলের সর্বসম্মত কোন নাম নেই। কারো কারো মতে অন্তরস্থি লোহা আর নিকেলের সংকরে তৈরি। আবার অনেকে বলেন সেখানেও মণিক আছে, তবে বিচিত্র সব মণিক। কোন কোন রুশ বিজ্ঞানী অনুমান করেছেন যে প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট হাইড্রোজেনের ধাতব রূপ হাইড্রোজেনাম দিয়ে এটি তৈরি। মহাবিশ্বে সব মৌলের মধ্যে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম—এ'দুটি গ্যাসের প্রাধান্য তাঁদের এই অনুমানের কারণ। তবে এই ধারণা বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

অন্তরস্থির ভৌত এবং রাসায়নিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুমানের আর একটি যুক্তি আছে। ভূগোলকের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 5.52 গ্রাম। প্রাথমিক তরঙ্গের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে গুটেনবার্গ ছেদতলে বস্তুর ঘনত্ব পাওয়া গেছে 9.72। যেকোনো ভূকম্পের উপকেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ বরাবর 103° থেকে 143°-এর মধ্যে যে ছায়াবলয় বর্তমান তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হল অস্থিতে অতি উচ্চ ঘনত্বে বস্তুর অস্তিত্ব থেকে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখলেন অন্তরস্থিতে যদি তরঙ্গের গতিবেগ 11 কিমি ছাড়িয়ে যায়, তবে অন্তরস্থি একটি গোলকীয় পরকলার (spherical lense) মতো প্রাথমিক তরঙ্গকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যে ঘনত্বের বস্তু থাকলে এই বিচ্যুতি ঘটা সম্ভব তা থেকে বহিঃপ্রক্ষেপণ (extrapolation) করে ভূকেন্দ্রে ঘনত্ব পাওয়া গেল 16। বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন যে অন্তরস্থির শুরুতে

অর্থাৎ 5,121 কিমি গভীরতায় বস্তুর ঘনত্ব 14। ভূকেন্দ্রে চাপের মাত্রা বস্তুর এই ঘনত্ব ধরে পাওয়া গেল প্রায় 3,60,000 কোটি বার। পরীক্ষাগারে এই বিপুল চাপের ধারেকাছেও পৌঁছনো যায়নি। তাই ভূকেন্দ্রে বর্তমান বস্তুর প্রকৃতি শুধুই অনুমানের বিষয়।

তবে কেন্দ্রে যাই থাকুক ভূচৌম্বকত্বের উৎস যে ভূগোলকের অষ্ঠি এটি বহুকাল ধরেই ভাবা হয়ে আসছে। আয়নোস্ফিয়ার আবিষ্কারের আগে এ সম্বন্ধে ঠিক মাত্রাসাপেক্ষ ধারণা না থাকলেও অনুমান করা হত যে ভূচৌম্বকত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ সূর্যের শক্তি বিকিরণে উৎপন্ন। আয়নোস্ফিয়ার আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে, তার জন্য মাত্র 2 শতাংশ ভূচৌম্বকত্ব ঘটে থাকে, বাকি 98 শতাংশ ভূগর্ভে কোন কারণে উৎপন্ন। বহুকাল আগে অবশ্য ভাবা হত যে, ভূগোলকের অষ্ঠিতে যে নিকেল ও লোহা, সে দুটি চৌম্বক শক্তি সম্পন্ন বলেই ভূগোলকও চৌম্বকত্ব সম্পন্ন। কিন্তু উত্তপ্ত করলে চুম্বক 750° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার উপরে তার চৌম্বকত্ব হারায়। ভূগর্ভে প্রতি কিলোমিটারে গড়ে 30° করে তাপমাত্রা বাড়ে। সুতরাং 25 কিলোমিটারের অধিক গভীরতায় কোন স্থায়ী চৌম্বকত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং অষ্ঠিতে লোহা আর নিকেলের অস্তিত্ব দিয়ে ভূচৌম্বকত্বের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলনা। বিজ্ঞানীরা তখন বললেন, ভূগর্ভের অসমসত্ত্বতা (inhomogeneity) এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তড়িৎ বিভবের (electrical potential) তারতম্য ভূচৌম্বকত্বের কারণ হতে পারে। তবে এজন্য ভূগোলক চৌম্বকধর্মী হলেও তা সাময়িক হবে। মাত্র দশলক্ষ বছরে এই চৌম্বকত্বের মাত্রা কমতে কমতে শূন্যে এসে দাঁড়াবে। ভূগোলকের প্রাচীনত্বের তুলনায় দশলক্ষ বছর কালটি যৎসামান্য। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে অনেকে বললেন যে, ভূগোলকের অসমসত্ত্বতা যদি ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে, তবে চৌম্বক ক্ষেত্রটি স্থায়ী হতে পারে। এরকম অবস্থায় চৌম্বক মেরুর অবস্থানও মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হবে।

ভূচৌম্বকত্বের কারণের ব্যাখ্যা করে দেওয়া এই মডেলের নাম ডায়নামো মডেল। 1919 সালে প্রথম ডায়নামো মডেল প্রস্তাবিত হয়। ক্রমশ পরিমার্জিত এবং পরিশোধিত হতে হতে 1972 সালে প্রস্তাব দেওয়া হল যে একটি কঠিন খোলকের মধ্যে বর্তমান অষ্ঠিতে বস্তুর পরিচলন স্রোত, অথবা ভূগোলকের আহ্নিক গতির জন্য নিয়মিত আলোড়নের ফলে ভূচৌম্বকত্বের অস্তিত্ব। এই মডেলটি দেন বুলার্ড (Bullard)। এখনও পর্যন্ত এই মডেলের ভিত্তিতেই বিভিন্ন ঘটনা বিশেষ করে প্রত্নচৌম্বকত্বের ব্যাখ্যা করা হয়।

1.8 সারাংশ

প্রাকৃতিক কারণে ভূগোলকের অভ্যন্তর যে কম্পন উৎপন্ন হয় তাকে ভূকম্প বলে। এই কম্পন তিন ধরনের তরঙ্গ রূপে পৃথিবীর নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ে। গতিবেগ অনুযায়ী ভূকম্প তরঙ্গগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : প্রাথমিক তরঙ্গ, অনুবর্তী তরঙ্গ এবং পৃষ্ঠ তরঙ্গ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ধস নামা, পাত সঞ্চালন প্রভৃতি নানা কারণে ভূকম্প হয়। ভূকম্পের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর বা ভূগোলকের অভ্যন্তরীণ গঠন নির্ণয় করা যায়।

1.9 নির্বাচিত উল্লেখ্য গ্রন্থ

1) Bullen, K. E., *Seismology*, Methuen and Co. Ltd., London, 1954.

2) Gütenberg, B. and Richter, C. F., *Seismicity of the Earth and Associated Phenomena*, Princeton University Press and Oxford University Press, 1954.

3) Bullard, E. C., *'The Interior of the Earth'* in the *The Earth as a Planet*, Vol. II, pp, 57-137, University of Chicago Press, 1954.

4) Lahiri Dipankar and Roy Sobhen, *The Earth Alive, Its Processes and Features*, Allied Publishers, 1985.

5) লাহিড়ী দীপংকর, সংসদ ভূবিজ্ঞানকোষ, 1999।

1.10 প্রশ্নাবলী

(A) বড় উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1) স্থানীয় ভূকম্প ও টেকটনিক ভূকম্পের পার্থক্য কী? টেক্‌টনিক্ ভূকম্পে উৎপন্ন ভূকম্প তরঙ্গাগুলি কি স্থানীয় ভূকম্পেও উৎপন্ন হয়? বিষয়টি চিত্র এবং যুক্তি সহকারে আলোচনা করতে হবে।

2) সমমাত্রা রেখাগুলি কেন বৃত্তাকৃতি হয়না? ভূকম্পের উৎসের গভীরতা ও উপকেন্দ্র কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

3) ভূকম্পলেখ-এর একটি বর্ণনা দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ভূকম্পতরঙ্গোর মধ্যে পার্থক্য কী? এই পার্থক্য ফলিত বলবিদ্যার আলোকে ব্যাখ্যা করে উপকেন্দ্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে স্থাপিত ভূকম্প পরিলেখন যন্ত্রে গৃহীত ভূকম্পলেখ থেকে সেগুলির সঞ্চারমাধ্যম সম্বন্ধে কী কী তথ্য পাওয়া যায়?

4) ভূকম্প তরঙ্গোর গতিবিধি পর্যালোচনা করে ভূগোলকে ক'টি সমকেন্দ্রিক বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে?

5) গভীরতা অনুযায়ী ভূকম্প ক'ভাগে ভাগ করা যায়? এই বিভাগগুলির ভূগাঠনিক তাৎপর্য কী? ভূপৃষ্ঠে যেসব অঞ্চলে ভূকম্প অনুভূত হয়না, সেসব অঞ্চলের নাম কী? অন্তত দুটি এরূপ অঞ্চলের নাম দিতে হবে। ছায়াবলয়ের সঙ্গো এসব অঞ্চলের পার্থক্য কী?

(B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1) উৎসবিন্দু থেকে ভূকম্প তরঙ্গাগুলি কোন দিকে সরল আর কোন দিকে বক্ররেখায় বিস্তৃত হয়? সচিত্র ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

2) ভূকম্পের উৎসে কেন পৃষ্ঠতরঙ্গের উৎপত্তি ঘটেনা?

3) ভূগোলকে পরিবৃত্তি অঞ্চলগুলি কি কি? কেন এই অঞ্চলগুলিকে পরিবৃত্তি অঞ্চল বলে?

4) ভূচৌম্বকত্বের কারণ সম্বন্ধে সর্বাধুনিক অনুমানটি কি? কোন তথ্য এই অনুমানের সমর্থক?

5) ভূগোলকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছেদতল কোনগুলি? কেন সেগুলির এই গুরুত্ব?

6) ভূকম্প বলয় বলতে কী বুঝায়? এই বলয়গুলিতে ভূকম্পের উৎস কোন গভীরতায়?

7) ভূত্বক ও ম্যান্টেল এবং ম্যান্টেল ও অস্থির মধ্যে ছেদতল উপকেন্দ্র থেকে কোন কোন দূরত্বে স্থাপিত পরিলেখন যন্ত্রে গৃহীত ভূকম্পলেখ থেকে অনুমান করা গেছে? পৃষ্ঠতরঙ্গের বিস্তারণ সম্বন্ধে কোন তথ্য থেকে ভূত্বকের গঠন সম্বন্ধে জানা গেছে?

8) ম্যান্টেল ও অস্থি সম্বন্ধে ভূকম্প তরঙ্গের বিস্তারণ থেকে অনুমিত চিত্র অন্য কোন কোন তথ্য থেকে সমর্থিত হয়েছে?

9) কয়না ভূকম্প থেকে দাক্ষিণাত্যের ভূগঠন সম্বন্ধে কি জানা গেছে?

(C) প্রশ্নোত্তরমূলক :

	হ্যাঁ	না
1) চ্যুতিতলে টেক্‌টনিক্ ভূকম্প উৎপন্ন হয়?		
2) ৎসুনামি ভূভাগে উৎপন্ন হয়।		
3) ভারতে ৎসুনামি একটি প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ।		
4) ভূচৌম্বকত্বের কারণ ভূগর্ভে বর্তমান একটি স্থায়ী চুম্বক।		
5) সিআলের অন্যতম শিলা বেসল্ট।		
6) ভূগোলকের অভ্যন্তরে শিলার তরল অবস্থা।		
7) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে টেক্‌টনিক্ ভূকম্প উৎপন্ন হয়।		
8) শিলামন্ডলের নিম্নসীমা মোহো।		
9) অ্যাস্‌থেনোস্ফিয়ার ঊর্ধ্ব ম্যান্টেলের অংশ।		
10) ভূগোলকের পরিবৃত্তি অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় মৌলের অনুপাত অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি।		

1.11 উত্তর সংকেত

(A) 1) গঠন 1.5

2) গঠন 1.3 ও চিত্র 1.1

3) চিত্র 1.2 ও তার উপরের অনুচ্ছেদ

4) 1.7.1, 1.7.2 ও 1.7.3

5) 1.5, para 4, 1.3 শেষ 2 para ও 1.7

(B) 1) 1.7 ও চিত্র 1.8

2) 1.7 ও চিত্র 1.8

3) 1.7.2 ও 1.7.3

4) 1.7.3 শেষ 2 para

5) 1.7 para 6

6) 1.3 শেষ para

7) 1.7 শেষ para 1.7.1

8) 1.7

9) 1.6

(C) 1) হ্যাঁ

2) না

3) না

4) না

5) না

6) না

7) না

8) না

9) হ্যাঁ

10) না